দৈনিক খবর

তারিখ 11 DEC 1991
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি ঃ কিছু প্রাসঙ্গিক কথা

হায়াত হোসেন
(অধ্যাপক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কারণ এ ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে তাদের অধিকাংশই কমিশনের নিকট বিশ্ববিদ্যালয় আইন '৭৩-এর সমালোচনা করেছেন। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ নষ্ট হওয়া, শিক্ষকদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি, অতিরিক্ত নির্বাচনের জন্যে লেখাপড়ার ক্ষতি ইত্যাদির জন্যে এ্যাক্টের সমালোচনা করে তার পরিবর্তন বা সংশোধনের জন্যে মতামত ব্যক্ত করেছেন। অথচ পরবর্তীতে সভা-সমিতিতে বলেছেন উল্টো কথা এবং দোষারোপ করেছেন তদন্ত কমিশনকে। এক্ষেত্রেও দেখা যায় গোলাপী দলের প্রবীণতম শিক্ষক অধ্যাপক আলী ইমদাদ খান বলেছেন, "Time has come for amending, the University Act 1973". আর দলের দু'নম্বর ব্যক্তি অধ্যাপক ফজলে হোসাইন বলেছেন, "the system of selection of a Vice-Chancellor should be modified and changed as this gives rise to groupings amongst the students and the teachers and the teachers should not take any direct or indirect part in the students politics or in the national politics." (পৃঃ ৯৪)। লক্ষণীয় ব্যাপার হলো তুলনামূলকভাবে উপাচার্যের বিরোধী ক্যাম্পের শিক্ষকগণ এ্যাক্ট পরিবর্তন সম্পর্কে কম বলেছেন যতোটা না বলেছেন তাঁর পক্ষের লোকেরা, বিশেষ করে যারা পরে তদন্ত কমিশনের রিপোর্টকে এ্যাক্ট বিরোধী বলে সমালোচনা করেছেন। এবার দেখা যাক উপাচার্য অধ্যাপক আলমগীর মোঃ সিরাজুদ্দিন এ ব্যাপারে কি বলেছেন। তিনি বলেছেন, "several provisions of the University Act, 1973 have Created certain problems in the smoothe functioning and running of the University and they requre neccessary amendment." (পৃঃ ১৫৭)। উপাচার্য নিজেই যদি একথা বলেন বা এ সমস্যা অনুভব করেন তাহলে আর অন্যদের, বিশেষ করে তাঁর সমর্থকদের সম্পর্কে আর কি বলা যায়। এখন কেউ যদি বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের smoothe functioning-এর জন্য একজন বিতর্কিত উপাচার্যকে অপসারণের provision এ্যাক্টে থাকতে বা আনতে হবে (যা এখন নেই) সেই যুক্তি খন্ডন করার কোন উপায় আছে কি? তবে এ্যাক্ট সংশোধনের মতামতটি দল মত নিরপেক্ষভাবেই প্রতিফলিত হয়েছে বলে ধারণা করা যায় এবং অনেক নিরপেক্ষ শিক্ষকও এ ব্যাপারে জোর দিয়েছেন, যেমন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অধ্যাপক কামাল নজরুল ইসলাম বলেছেন, "the Concerne authority should consider seriously the method of selecting the Vice-Chancellor. The teachers of the University should not take any direct or indirect part in the student Politics or in the politics of the country and there should be a written code of conduct for, the teachers of all

conduct for, the teachers of all Universities". (পৃঃ ১১৮)।

অতএব, দেখা যাচ্ছে কমিশনের নিকট সাক্ষ্যদানকারী অধিকাংশ শিক্ষকই কোন না কোনভাবে এ্যাক্টের সংশোধন চেয়েছেন এবং এতে নিশ্চয়ই অন্যায়ের কিছু নেই। ১৯৮৭ সালের প্রথমদিকে দৈনিক সংবাদ-এ বিশ্ববিদ্যালয় আইন '৭৩-এ প্রয়োজনীয় ও সময়োপযোগী সংশোধনী আনার জন্য ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের লেখা প্রকাশিত হয়। ১৯৯০ সালে জনৈক ভ্রাত্রেক বিন ফজলের লেখা 'বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ '৭৩ ও শিক্ষকদের ভাবনা' নামক একটি সাক্ষাৎকার ভিত্তিক গ্রন্থে দেখা যায়, ঢাকা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথমসারির প্রায় সব শিক্ষকই এ্যাক্টের কিছু না কিছু সংশোধন চেয়েছেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যপন্থী শিক্ষকগণের মনে ভয় হলো সরকার না আবার এ্যাক্ট লংঘন করে উপাচার্যকে অপসারণ করেন যেহেতু এই এ্যাক্টে উপাচার্যের অপসারণের নিয়ম সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই। তাই তারা হঠাৎ বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট '৭৩ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের রক্ষাকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন অথচ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের একগুঁয়েমী ও ক্ষমতা লিপ্সার কারণেই যে সরকার এ্যাক্টে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ নেবেন এটা তারা বুঝতে চান না। উপাচার্য পদত্যাগ করলে এ নিয়ে আর কারো মাথাব্যথা থাকতো না।

আর সরকারকে তো একটা পদক্ষেপ নিতেই হবে, কারণ একজন ব্যক্তি বা একটি সংগঠন থেকে একটি প্রতিষ্ঠান অনেক বড়। একজন বিতর্কিত ও অবিবেচক শিক্ষাবিদ বা একটি সন্ত্রাসী ছাত্র সংগঠনের জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য অচল থাকতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয় আইন '৭৩-এর প্রণেতারা এ্যাক্টে উপাচার্যের অপসারণের কোন ধারা রাখেননি হয়তো এ কারণেই যে, এমন সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত একজন শিক্ষাবিদকে অপসারণ করার আগেই তিনি সসম্মানে সরে পড়বেন বা তাঁকে নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হলে বা তাঁর নিয়োগদাতা অর্থাৎ সরকারের আস্থা হারালে তিনি নিজেই পদত্যাগ করবেন, যেমনটি করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এককালীন উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল হালিম চৌধুরী। এতে বুদ্ধিজীবী মহলে তাঁর জনপ্রিয়তা আরো বেড়ে যায়। এছাড়াও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মান্নান তাঁদের নিয়ে সৃষ্ট বিতর্ক-ও সরকারী মনোভাবের দিকে লক্ষ্য রেখে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন এবং সরকারই তাঁদের অন্যত্র সম্মানজনক পদে বহাল করেন। তবে সরকার চাইলে একজন উপাচার্যকে যথেষ্ট হেনস্থা করতে পারে। প্রেসিডেন্ট জিয়ার সময় তদন্ত কমিশনের রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মতিন চৌধুরী ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে চাকরিচ্যুত ও কারারুদ্ধ হন এবং তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো যে ভিত্তিহীন ছিল তাও নয়। তবে সবচেয়ে অপমানজনকভাবে উপাচার্য পদ থেকে অপসারিত হন ১৯৭৫ সালের প্রথমদিকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য অধ্যাপক আলী আহসান ও ১৯৮৪ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মোসলেম হুদা। উপাচার্য সৈয়দ আলী আহসান যখন ভারতে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে উপাচার্য হিসেবে ভাষণ দিচ্ছিলেন তখনই বাংলাদেশ বেতার ও আকাশবাণীর খবরে শোনা যায় তিনি উপাচার্য পদ থেকে ইতিমধ্যে অপসারিত এবং এ কাজটি করার আগে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর সাথে একটি কথা বলারও প্রয়োজন বোধ করেননি। আর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ হুদাকে প্রেসিডেন্ট এরশাদ অপসারণ করেন স্থানীয় এক্জন সামরিক কর্মকর্তার সাথে খারাপ সম্পর্কের কারণে। তাঁকে জেলে পাঠানো হয় এবং তাঁর সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করা হয়।

এসবের তুলনায় বর্তমান সরকার তো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সাথে অনেক সভ্য আচরণ করেছেন। তদন্ত কমিশনের রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে তারা তাঁকে সসম্মানে পদত্যাগ করার অনুরোধ করেছেন এবং অন্যত্র ভালো পদে বহাল করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। কিন্তু একজন শিক্ষাবিদ হিসেবে তিনি এটা না করে ঘটনাটিকে রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত করলেন, চট্টগ্রামে একদিন হরতাল করালেন, শহরের একটি কলেজে বিকল্প বিশ্ববিদ্যালয় চালু করাবার প্রহসন করলেন, নিজে ক্যাম্পাস থেকে সরে গিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য আত্মগোপন করেছিলেন। এসব কি একজন উপাচার্যের জন্যে সম্মানজনক কাজ? বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট '৭৩ ছাড়াও বাংলাদেশ সংবিধানের আওতায় অন্য আইন আছে যা দিয়ে সরকার একজন উপাচার্যকে অপসারণ করতে পারেন। কিন্তু এতোকিছুর পরও সরকার তা করেননি, বরঞ্চ তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী ও সংসদ উপনেতা ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরী আরো একজন মন্ত্রী ও চট্টগ্রামের মেয়রসহ উপাচার্যের বাসভবনে গিয়ে তাঁকে বুঝিয়েছেন তিনি যদি সসম্মানে পদত্যাগ করেন তাঁকে অন্যত্র ভালো পদ দেয়া হবে, যদিও জুডিশিয়াল কমিশন কর্তৃক দোষী কোন ব্যক্তিকে এভাবে পুরস্কৃত করা ঠিক নয়। -(চলবে)

একজন উপাচার্যকে তাঁর মান-সম্মান বা আত্মসম্মান সম্পর্কে বোঝাতে হচ্ছে অন্যদের এসে, তাতেও কাজ হচ্ছে না। এখন কি বলা যায় যে, শিক্ষা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাজার হাজার শিক্ষার্থীর জীবন সম্পর্কে উপাচার্যের সামান্যতম সহানুভূতি, শ্রদ্ধাবোধ বা বিবেচনা আছে যেখানে তাঁর জন্য প্রতিষ্ঠানটি প্রায় এক বছর ধরে অচল হয়ে আছে? সন্ত্রাসীদের কথা আলাদা। চোর না শুনে ধর্মের কাহিনী। তাদের কাছে আবেদন-নিবেদন করে লাভ নেই। তাদের বিরুদ্ধে যথাসময়ে কঠোরতম আইনের বিধান প্রয়োগ করতে হবে। তবে এ সরকার যে তা এখন করবে না সেটা খুবই স্বাভাবিক, কারণ যে উপাচার্য তাদের কথা শুনছে না তাঁকে কেন সরকার সাহায্য করবে? উপাচার্যের কিছু চাটুকারেরা তাঁকে এই বলে বাহবা দিচ্ছেন যে, তিনি সন্ত্রাসের কাছে মাথানত করেননি বা করছেন না। অথচ দেখা যাচ্ছে সরকারের নির্লিপ্ততার সুযোগে শিবিরের সন্ত্রাস বেড়ে গেছে বহুগুণ, এমনকি তারা উপাচার্যকে ক্যাম্পাসের বাইরেও কোন সভা করতে দিচ্ছেন না, যা এর আগে অকল্পনীয় ছিল। মাইক লাগিয়ে তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হচ্ছে এবং সমগ্র ক্যাম্পাসে শিবিরের নিয়ন্ত্রণ এখন আগের চেয়ে অনেক বেশী। তাহলে লাভ হলো কার, মৌলবাদীদের না প্রগতিশীলদের? অথচ উপাচার্যপন্থীরা এখনো ঢোল পিটাচ্ছেন উপাচার্যের জয়গান গেয়ে তিনি যেন রাজাকার বিরোধী মহান এক যোদ্ধা। উপাচার্য হিসেবে রাজাকারদের হাতে যার জন্ম ও লালন-পালন এবং অতীতে যিনি 'সন্ত্রাসের জনক' হিসেবে ক্যাম্পাসে পরিচিত আজ হঠাৎ তিনি মৌলবাদ বিরোধী বিপ্লবী কেন সাজলেন তা উপাচার্যের কৃপাপুষ্ট কিছু নব্য বিপ্লবীরা না বুঝতে চাইলেও অন্যদের কাছে এটা ক্রমশঃ পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। ছাত্র শিবির তো প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছে, দেশের সবচেয়ে কট্টর কম্যুনিষ্ট বুদ্ধিজীবী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়ে আসলেও তাদের আপত্তি নেই কিন্তু যে তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাঁকে তারা থাকতে দেবে না। অবশ্য এটা কারো অজানা নয় যে, ১৯৮৮ সালে জামায়াত-শিবিরের প্রচন্ড তদবীর ছাড়া তদানীন্তন উপ-উপাচার্যকে ডিঙ্গিয়ে অধ্যাপক আলমগীর সিরাজুদ্দিন কোনদিনই অস্থায়ী উপাচার্য হতে পারতেন না। এক বছর পর জামায়াতের নিয়ন্ত্রণাধীন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটেও সর্বাধিক ভোট পেয়ে তিনি চার বছরের জন্য স্থায়ী উপাচার্য হন। অতএব, দেখা যাচ্ছে মৌলবাদীদের সাথে তাঁর এখনকার বিরোধ সম্পূর্ণ স্বার্থের বিরোধ, আদর্শিক নয়।

উপাচার্যই অতীতে মৌলবাদীদের প্রশ্রয় দিয়েছিলেন

অধ্যাপক সিরাজ যে উপাচার্য হওয়ার পর প্রথম কয়েক বছর শিবিরের সন্ত্রাসীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়েছেন, কোন অপরাধের জন্য তাদের শাস্তি দেননি বরং তাদের অন্যায় আবদার দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলেছেন, তাঁর দলের অনেক শিক্ষকও একথা তদন্ত কমিশনের নিকট স্বীকার করেছেন। এ ব্যাপারে অধ্যাপক